দুর্নীতি প্রতিরোধে চাই মানসিতার পরিবর্তন

মাসুদুর রহমান

মহান মুক্তযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত আমাদের পবিত্র সংবিধানের ২০(২) অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে সমর্থ হইবেন না।" জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের স্বাধীনতা দিবসের এক বক্তৃতায় একাত্তরের মতো প্রতিটি ঘরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দুর্গ গড়ে তুলার আহবান জানিয়েছিলেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন দুর্নীতি বিরোধী আইনের কথা, দুর্নীতিবাজ কাউকে ছাড় না দেওয়ার প্রত্যয়সহ প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় জাতির পিতা তার সেই প্রত্যয় বাস্তবায়নের পূর্বেই ঘাতকের নির্মম বুলেটে স্ব পরিবারে শহিদ হন। থেমে যায় জাতির পিতার স্বপ্ন, সোনার বাংলায় নেমে আসে দুঃস্বপ্নের কালো রাত। ক্রমেই সকল সেক্টরে অরাজকতা আর দুর্নীতি গ্রাস করে। দেশের সকল সচেতন নাগরিককে দুঃখে ভাসিয়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ হয় দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গঠনের পর দুর্নীতি দমন কমিশনকে কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তৎকালীন এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব গোলাম রহমানকে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়। তার নেতৃত্বে প্রায় অকার্যকর কমিশন ঘুরে দাঁড়ায়। ওয়ান ইলেভেন পরবর্তী সময়ে যোগ দেওয়া এ চেয়ারম্যানের আমলে বিভিন্ন মহলের নানামুখী চাপ অগ্রাহ্য করে কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করে। এসময়ে হলমার্ক, ডেসটিনি ও রেলওয়ের নিয়োগ জালিয়াতির হোতাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তাদের সকলকেই জেলে যেতে হয় এবং বিচারের মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। পদ্মা সেতুর তথাকথিত মিথ্যা অভিযোগের বিষয়টিও এ কমিশন তদন্ত করে। কমিশন অভিযোগ সত্য নয় মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো। পরবর্তীতে বিদেশে বিভিন্ন তদন্ত সংস্থাও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

দুর্নীতি দমন ব্যুরো বিলুপ্ত হয়ে কমিশন হঠিত হওয়ার পর ২০০৯ সাল পর্যন্ত পূর্বের বুরোর আমলের অনিস্পন্ন মামলাগুলোর তদন্ত ও অনুসন্ধান থমকে যায়। যার ফলে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ নানা ধরনের সমস্যায় পড়েন, বিশেষ করে সরকারি কর্মচারীরা সময়মতো তাদের পদোন্নতিসহ চাকরির অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। বিষয়টি বিবেচনা করে কমিশন থেকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

দুর্নীতি দমন কমিশন তার তফসিলভুক্ত অপরাধের বাইরে কোনো আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। দুদকের তফসিলভুক্ত অপরাধ হলোঃ সরকারি কর্তব্য পালনের সময় সরকারি কর্মচারী/ব্যাংকার/সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উৎকোচ (ঘুষ)/ উপঢৌকন গ্রহণ, সরকারি কর্মচারী বা সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো যে কোনো ব্যক্তির অবৈধভাবে নিজ নামে বা বে-নামে সম্পদ অর্জন, সরকারি অর্থ বা সম্পত্তি আত্মসাৎ বা ক্ষতিসাধন, সরকারি কর্মচারী কর্তৃক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যবসা বা বাণিজ্য পরিচালনা, সরকারি কর্মচারী কর্তৃক জ্ঞাতসারে কোনো অপরাধীকে শাস্তি থেকে রক্ষা করার চেষ্টা, কোনো ব্যক্তির ক্ষতিসাধন কল্পে সরকারি কর্মচারী কর্তৃক আইন অমান্য করণ,মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর অধীন সংগঠিত অপরাধ সমূহ এবং সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকার কর্তৃক জাল-জালিয়তি এবং প্রতারণা ইত্যাদি।

এ তফসিলভুক্ত অপরাধগুলো দুদক তার নিজস্ব জনবল দিয়ে অনুসন্ধান ও তদন্ত করে থাকে। এছাড়া যে কোনো সচেতন নাগরিক দুদক অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন ১০৬ (টোল ফ্রি)এ কল করে তাৎক্ষণিক অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। সাধারণ নাগরিকদের লিখিতভাবে তফসিলভুক্ত অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয়, ১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা, সকল বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয় এবং উপপরিচালকের কার্যালয়ে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও chairman@acc.org.bd এবং কমিশনের ভেরিফাই ফেজবুক পেজ Anti Corruption Commission-Bangladesh এ বিধি মোতাবেক অভিযোগ করার সুযোগ রয়েছে। কমিশন সাধারণত পাঁচটি উৎস থেকে অভিযোগ পেয়ে থাকে। এগুলো হলো ১০৬ হটলাইন, গণমাধ্যম ও অন্যান্য উন্মুক্ত উৎস, অভিযোগ বাক্স, গোয়েন্দা তথ্য এবং বিএফআইইউ ও অন্যান্য সরকারি সংস্থা। অভিযোগ পাওয়ার পর প্রধান কার্যালয়ের যাচাই-বাছাই কমিটি এগুলো যাচাই-বাছাই করে কমিশনের নিকট সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সুপারিশ করে। এখানে উল্লেখ অভিযোগ অনুসন্ধানের গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণে গ্রেডিং পদ্ধতি আছে। নির্ধারিত নম্বরের কম

পেলে সেসব অভিযোগের ওপর কোনো আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুযোগ নেই। যেমন কোনো ব্যক্তি অবৈধ সম্পদ অর্জন করে থাকলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের ক্ষেত্রে তার নাম, পদবি বা পেশা, পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা, স্থাবর সম্পদের বিবরণ এবং অবস্থান, পরিমাণ, আনুমানিক মূল্য, ব্যংক হিসাবের তথ্য, শেয়ার, সঞ্চয়পত্রের তথ্য, গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর, মডেল, ক্রয়ের সময়কাল, ব্যবসা বাণিজ্যের ধরন, সুনির্দিষ্ট অবস্থান, বৈধ আয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এমন জীবন-যাপন সংক্রান্ত বিবরণ ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে। এর প্রতিটির জন্য নির্ধারিত নম্বর আছে। কমিশনের বৈঠকে উপস্থাপিত অভিযোগগুলো বিশ্লেষণ করে তিন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়। যে অভিযোগ গুলো বিবেচনা যোগ্য নয় সেগুলো নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। যে অভিযোগগুলোর গুরুত্ব আছে কিন্তু দুদকের তফসিলভুক্ত অপরাধ নয়, সেগুলো সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। আর যেগুলো দুদকের তফসিলভুক্ত অপরাধ সেগুলো অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। অনুসন্ধানের পর যেগুলো প্রথমিকভাবে অপরাধ প্রতিষ্ঠিত নয় সেগুলো অভিযোগ পরিসমাপ্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। যেগুলো অপরাধ প্রতিষ্ঠিত নয় কিন্তু অসাদাচরণ পাওয়া যায় সেগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয় এবং যেগুলোর প্রাথমিকভাবে অপরাধ প্রতিষ্ঠিত সেগুলো মামলা করার জন্য তদন্ত করা হয়। বিধি মোতাবেক তদন্তের পর অপরাধ প্রমাণিত নাহলে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৭৩ ধরা মোতাবেক চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেওয়া হয়। অপরাধ প্রমাণিত কিন্তু দুদক তফসিলভুক্ত নয় সেগুলো সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থায় প্রেরণ করা হয়। আর যেগুলো অপরাধ প্রমাণিত সেগুলোর অভিযোগপত্র দেওয়া হয়। এ অভিযোগের ভিত্তিতে বিজ্ঞ আদালত বিচার কার্য শেষ করেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের আইন অনু বিভাগটি একজন মহাপরিচালকের অধীনে পরিচিত হয়। এ অনু বিভাগটির লিগ্যাল ও প্রসিকিউশন নামে পৃথক দুইটি শাখা দুইজন পরিচালকের তত্ত্বাবধানে কাজ করে। এ অনু বিভাগের তত্ত্বাবধানে কমিশনের নিয়োগকৃত বিজ্ঞ আইনজীবীগণ সংশ্লিষ্ট আদালতে কমিশনের পক্ষে মামলা পরিচালনা করে থাকেন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণা অনুযায়ী কার্যকর দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলে দেশের জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির হার ১০ শতাংশ বেশি হতো। দুদক চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল মাহমুদের মতে ভূমি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতির কারণে মানুষ ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশেষ জজ আদালতে ৩১৭টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে যার মধ্যে ২৮২টি (প্রায় ৮৯%) দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়ের কৃত মামলা এবং বাকি ৩৫টি বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরো থেকে প্রাপ্ত। বিবেচ্য ২৮২টি মামলার মধ্যে ১৭৭টি মামলায় সাজা হয়েছে। সাজার প্রায় ৬৩% ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৩২৯৯টি। এ সময়ে দুদকের করা মামলার বিচার আদালত ৩ হাজার ৪ শত ৯৭ কোটি টাকারও বেশি জরিমানা এবং ৪৩৬ কোটি ৮৮ লাখ টাকারও বেশি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করেছে।

কমিশন শুধু দেশে নয় বিদেশেও অবৈধ সম্পদ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ২০১৯ সালে কমিশনের সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তা বিভিন্ন দুর্নীতির মামলায় ১২৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে। এর মধ্যে ব্যাংক কর্মকর্তা ২০ জন, সরকারি কর্মকর্তা ৮৪ জন জনপ্রতিনিধি ৩ জন ব্যবসায়ী ও অন্যান্য ১৬ জন।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারে দুর্নীতিকে একটি বহুমাত্রিক ব্যাধি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। দুর্নীতি দমনে সরকার ও জনগণের সমন্বিত পদক্ষেপের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ঘুষ, অনোপার্জিত আয়, কালো টাকা, চাঁদাবাজি, ঋণখেলাপি ও পেশিশক্তি প্রতিরোধ এবং দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন নির্মূলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার করা হয়েছে। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ নির্মাণের জন্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে সকল সচেতন জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুখী সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ রেখে যাওয়া জন্য মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে এ যুদ্ধে আমাদের জিততেই হবে।

#

১১.০২.২০২১ পিআইডি ফিচার